দৈনিক সংবাদ জানুয়ারী ২৩, ২০০৬

অভিমত- জঙ্গি মৌলবাদ থেকে রক্ষা পেতে '৭২-এর সংবিধানে ফিরতে হবে

আবুল হোসেন খোকন।।

জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান নিয়ে নানা কথা উঠেছে এবং এ থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তা নিয়ে বহু কথাও হচ্ছে। এমন কী মৌলবাদী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারও এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা বলছে এবং এই রক্ষার নামে কিছু গ্রেফতার, কিছু গোলা-বারুদ উদ্ধার এবং লোক ভোলানো কিছু কথাবার্তা দিয়ে সমাধান টেনে চলেছে। কিন্তু জঙ্গি মৌলবাদের গোড়া কোথায়, কোথা থেকে এর উৎপত্তি এবং কোথায় হাত দিলে প্রকৃতই এদের নির্মূল করা যাবে সে বিষয়ে বলা হচ্ছে না। জনগণকেও এ ব্যাপারে বেশ কৌশল করেই আড়ালে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। যাতে করে তারা আসল জায়গাটা দেখতে না পায় এবং আসল জায়গায় পৌঁছার কথাটা না ভাবে। সে কারণে জঙ্গি মৌলবাদের উত্থানের উৎস কীভাবে কোথায় এ প্রশ্নে সবাইকে পরিস্কার হওয়াটা বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এখন লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যখন থেকে বাংলাদেশের সংবিধানকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হয়েছে অর্থাৎ সংবিধানকে ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থা থেকে একটি ধর্মের প্রতি আস্থাশীল করা হয়েছে তখন থেকেই সংবিধানের প্রভাব থেকেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের যাবতীয় হাতিয়ার বা সেক্টরগুলো একই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ফলে অফিস-আদালত-প্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যা কিছু আছে, তার সবই একটি ধর্মের প্রতি আস্থার নীতি দাঁড়িয়ে গেছে। সংবিধান যেহেতু রাষ্ট্রের মূল, সেহেতু মূল থেকে সকল শাখা-প্রশাখা বা সঞ্চালন ক্ষেত্রগুলোতে তার কর্তৃত্ব অথবা প্রভাব প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে সামাজিকভাবে সাম্প্রদায়িতকতা বা মৌলবাদের অবস্থান ও শক্তির ভিত গড়ে উঠতে শুরু করে এবং তা শেষ পর্যন্ত এখন মহীরুহের রূপ ধারণ করে ফেলেছে। সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন সব কিছুই সেই অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এর দার্শনিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সর্বস্তরে মৌলবাদের উত্থানের হলো মূল কথা।

এখানে মৌলবাদের আরেকটি নীতি বা দর্শন সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। তা হলো, গণতন্ত্র এক ধরনের দর্শন আর মৌলবাদ আরেক ধরনের দর্শন। মৌলবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, সে তার একক নীতিকেই নিরঙ্কুশ বা সেই একক নীতির পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে এর কাছে গণতন্ত্র হয়ে ওঠে টার্গেট, গণতন্ত্রকে খতম করার জন্য তখন মৌলবাদ স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় ওয়ে ওঠে। কারণ গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধনই মৌলবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূল কথা। সুতরাং শুরু থেকে দেখতে গেলে মৌলবাদের একটা পর্যায় চলে তার শক্তি বৃদ্ধির কার্যক্রমের মধ্যে। শক্তি বৃদ্ধি হয়ে গেলে আসে প্রচলিত ব্যবস্থা, গণতন্ত্র এবং সংবিধান ও শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে ধ্বংস করার জন্য আঘাত হানা বা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ার কাজ।

আমরা যদি বাংলাদেশের ঘটনা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এমন একটি গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ অর্জন করি যার সংবিধানিক ভিত্তি হয় ধর্মনিরপেক্ষ। ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশের জন্য তথা বাংলাদেশের সব ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষের মানুষের জন্য ছিল নিরপেক্ষ একটি বিধান। এই বিধান কোন একটি পক্ষের ছিল না। এরকম একটি সুমহান বিধানের জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের। কারণ যার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ সেই পাকিস্তানি বিধান ছিল অনিরপেক্ষ তথা একটি ধর্মীয় দর্শনের বিধান। যার কারণে পাকিস্তানি রাষ্ট্র বা তার শাসন কাঠামো থেকে নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রাপ্তির কোন বিষয়ই ছিল না। এতে করে দেশের একটি ধর্মের মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে বাকি সর্ব ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী ছিল পদানত। এখান থেকে বেরিয়ে আসতেই দর্শনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রয়োজনের তাগিদেই দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এবং পাকিস্তানসহ পাকিস্তানি দর্শনকে হটিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। কিন্তু দেখা গেল পরাজিত পাকিস্তান এবং তার আন্তর্জাতিক মিত্ররা শেষ পর্যন্তও প্রতিশোধ গ্রহণে পিছু হটেনি। এই প্রতিশোধের জন্য তারা স্বাধীন বাংলাদেশ ব্যবহার করে তাদের এদেশীয় সহযোগী এবং দালালদের। এই দালালদের মধ্যে সর্বজনচিহ্নিত এবং অচিহ্নিত উভয়েই ছিল। চিহ্নিতরা ছিল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, আলবদর, আলশামস, রাজাকার তথা ধর্মান্ধ পাকিস্তানপন্থীরা। আর অচিহ্নিতরা ছিল একেবারেই লুকিয়ে। এদের অবস্থান ছিল সেনাবাহিনীতে, প্রশাসনে, এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝেও। তার প্রমাণ মিলেছে পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। দেখা গেল সামরিক বাহিনীর ভেতর থেকে একদল সদস্য রাতের অন্ধকারে মুক্তিযুদ্ধের সরকারের ওপর আঘাত হানলো, তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করলো এবং রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সরকারকে বিদায় করে দিল। এ ঘটনায় সমর্থন জানালো পাকিস্তানি

হানাদার বাহিনীর দোসর জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, আলবদর, আলশামস, রাজাকাররা। উল্লাসে ফেটে পড়লো তারা। এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল জিয়াউর রহমান। যিনি সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে দিলেন ধর্মনিরপেক্ষতাকে। ফের কায়েম করলেন পাকিস্তানি দর্শন-ধর্মভিত্তিক সাংবিধানিক নীতি। মজার ব্যাপার হলো যে জিয়াউর রহমান এই কাজটি করলেন যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ফলে পরিষ্কার হয়ে যায় পাকিস্তানিদের অনুগত লোকদের লুকিয়ে থাকার বিষয়টি। শুধু জেনারেল জিয়ার বেলায় নয় এ বিষয়টি আরও দেখা যায় যারা কি না ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে মুক্তিযুদ্ধের সরকার উৎখাতে অংশ নিয়েছিল সেই মেজর ফারুক-রশিদ গংয়ের বেলায়ও। তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, অথচ তাদের আসল পরিচয় গোপন থেকে গিয়েছিল। খন্দকার মুশতাকও এদের একজন। যা হোক, এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বহুল প্রত্যাশিত সংবিধানকে কাট-ছাঁট, ক্ষত-বিক্ষত করে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানপন্থী সংবিধানে পরিণত করা হয়। এরপর আরেক জেনারেল এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসেন, তিনি আরও অগ্রসর হয়ে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যুক্ত করে শতভাগ সাম্প্রদায়িক করে ফেলেন বাংলাদেশের সংবিধানকে। আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দর্শনের শত্রুরা পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক দর্শন প্রতিষ্ঠিত করে। আগেই বলেছি, এভাবে দর্শনিক ভিত্তি তৈরি করার পর আসে আঘাত হানার পালা। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা, বিধান, গণতন্ত্র, শাসনতান্ত্রিক শক্তিকে খতম করে পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেয়ার পালা। জঙ্গি মৌলবাদীরা দেশব্যাপী বোমা হামলা করে সেই কাজটাই শুরু করেছিল, আর রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হিসেবে অবস্থান নিয়ে আসল মৌলবাদী শক্তি জামায়াতে ইসলামী তালেবানি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সে লক্ষ্যে তারা যুদ্ধে নেমে পড়েছিল বলা যায়। এখন প্রশ্ন হলো এই যুদ্ধে নেমে পড়ে ফলাফল কি হলো?

এর উত্তর দেশবাসীর সামনে পরিষ্কার। সবার সামনেই সব ঘটেছে বা ঘটছে। সবার কথা হলো, এরকম একটি ঘটনা ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় আপাতত ব্যর্থ হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর মৌলবাদী নেটওয়ার্ক। ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই যে, দেশের মানুষ এখনও সচেতন এবং তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মভীরু হলেও ধর্মান্ধ বা মৌলবাদী নয়। তাদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক দর্শনগত চেতনা সক্রিয় রয়েছে। মানুষ পশু হয়ে যায়নি। জামায়াতিরা যা ভেবেছিল তা হয়নি। মানুষ এখনও মানুষই আছে। সুতরাং মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে মানসিকভাবে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। এতে করে পিছু হটতে হয়েছে মৌলবাদী জঙ্গিদের। পিছু হটতে হয়েছে তাদের চারদলীয় জোট সরকারকে। সরকার এখন বাধ্য হয়ে জঙ্গি পাকড়াও করতে কার্যত একটা 'আইওয়াশ' পদক্ষেপ নিয়ে শত্রুদের রক্ষার যাবতীয় কৌশল বাস্তবায়ন করে চলেছে। তবে সরকারের ছত্রছায়ায় অবস্থানকারী এই মৌলবাদী জঙ্গি অপশক্তির পিছু হটাকে মোটেও পাততারি গুটিয়ে ফেলা বলা যাবে না। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতায় এখনও তারা অধিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের ভেতরে গড়ে তোলা তাদের সাম্প্রদায়িক নেটওয়ার্ক বহাল তবিয়েতে রয়ে গেছে। সংবিধানও ধর্মভিত্তিক হয়ে আছে। এক কথায় পুরো দর্শনই শক্তি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়েছে। তাই আপাতত পিছু হটাটা আসলে হাল ছেড়ে দেয়া নয়, বরং নতুন আঘাত হানার জন্য গুছিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা। তাদেরকে ফের অগ্রসর হতে হবে বেশ তাড়াতাড়িই। কারণ ক্ষমতায় থাকতে থাকতেই তাদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করতে হবে। ক্ষমতা হাত ছেড়ে চলে গেলে কাজ হবে না। তাই তাদের জন্য দেরির সময় তেমন একটা নেই বলা যায়। প্রশ্ন হলো, সামনে তাদের জন্য কীভাবে বা কোন পন্থায় পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বোমা হামলার মিশন নামিয়ে জামায়াতকে বড় রকমের ধাক্কা খেতে হয়েছে। এ হামলা আপাত ফেল মেরেছে। জাতীয়-আন্তর্জাতিক চাপে বোমা হামলার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে সরকারকে বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ নেয়ায় এই নেটওয়ার্ক অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। গ্রেফতার অভিযানের মাধ্যমে একদিকে 'আইওয়াশ', আরেকদিকে ধৃত জঙ্গিদের সাময়িক আটক রাখার কৌশলের ফলে মাঠপর্যায়ের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড অনেকটা নষ্ট হয়েছে। ফলে এখন নতুন কিছু করার আগে স্থির হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সোজা কথায় কিছুদিন সময় হাতে পাওয়া এখন মৌলবাদী জঙ্গিদের জন্য, বিশেষ করে এদের গডফাদার জামায়াতের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জরুরি কাজটার স্বার্থেই সংলাপ নাটক মঞ্চায়ন, লোক ভোলানো নানা কথা বলে পরিস্থিতিকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করা এবং মহাসমাবেশ করে হুমকি-ধামকি দিয়ে অন্যকিছু ইস্যু সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে মানুষের দৃষ্টিকে আরেক দিকে সরিয়ে দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এভাবে সামলে নেয়ার পরই আসতে পারে পরবর্তী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পালা।

এরকম পদক্ষেপ এক হতে পারে, বিএনপিকে গিলতে গিলতে তাদের সঙ্গে জোট রেখে আবারও নির্বাচন করে বিজয়ী হওয়ার একটা নীলনকশার পরিকল্পনা করা। দুই হতে পারে, নিজেদের স্বপক্ষীয় অসাংবিধানিক বিশেষ শক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা বা তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সময় আরেকটু গড়িয়ে নেয়া। তারপর নতুন পরিস্থিতি তৈরি করে এককভাবে ক্ষমতা দখল করার পথে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং বলা যায়, জঙ্গি মৌলবাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা পরিচালনার নামে এখন যে কাজগুলো সরকার থেকে করা হচ্ছে, বা এর সমর্থনে যারা সাফল্যের কথা ভাবছেন তা মোটেই সঠিক নয়। এতে করে মৌলবাদের নির্মূল তো ঘটবেই না, বরং তা আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেয়ার পথে পরিষ্কার করবে।

এ কারণে মূলে ফিরে দেখতে হবে, যেতে হবে মৌলবাদের উত্থানের গোড়ায়। তাহলেই দেখা যাবে এর বিস্তার-বিস্তৃতি আর ভিত্তিটাকে। সুতরাং জঙ্গি মৌলবাদ থেকে রক্ষা পেতে হলে মূলটাকে আগে ঠিক করতে হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূল সংবিধানকে অসাম্প্রদায়িক করতে হবে। এজন্য ফিরে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান ১৯৭২-এর সংবিধানে, নিষিদ্ধ করতে হবে ধর্মভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এবং এখানেই থেমে গেলে চলবে না, যারা বাংলাদেশকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যাওয়ার মিশন নিয়ে তৎপর সেই '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের মাধ্যমে শাস্তি দিতে হবে। সেই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দর্শনকে মানুষের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা কিছু করণীয় তা করতে হবে। তবেই বাংলাদেশ মৌলবাদের কবলমুক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে দাঁড়াতে পারবে। জঙ্গি হামলার মুখে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশের মানুষ শুভমুক্তির স্বার্থে এখন এরকম একটি প্রত্যাশাকেই প্রধান্য দিয়ে চলেছে।

দৈনিক সংবাদ, জানুয়ারী ২৩, ২০০৬